১। 'মহেশ' গল্পটিতে দরদী শিল্পী শরৎচন্দ্র সমসাময়িক সমাজের যে ছবি এঁকেছেন তা নিজের ভাষায় পরিস্ফুট কর।

☞ শরৎচন্দ্র ছিলেন মানবপ্রেমী কথাশিল্পী। তাঁর বেশিরভাগ লেখাতেই মানুষের কথা, মানুষের সুখ-দুঃখের মর্মবাণী রচিত হয়েছে। সংসারে বঞ্চিত, অসহায় যারা তাদের কথা বলার জন্য তিনি কলম ধরেছিলেন। সমাজচেতনাও তাঁর সুগভীর ছিল। তিনি নিজের চোখে সমাজের যেসব ঘটনা দেখেছেন তা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর অমর সৃষ্টি 'পল্লীসমাজ', 'পণ্ডিতমশাই', 'বামুনের মেয়ে', 'শ্রীকান্ত' প্রভৃতি উপন্যাসে। এছাড়া 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'একাদশী বৈরাগী' প্রভৃতি বিস্ময়কর ছোটগল্প তিনি যে সত্যিকারের সমাজসচেতন ও মানবদরদী ছিলেন তার এক প্রামাণ্য দলিল। শরৎচন্দ্রের ছিল অনুভব করার মতো মন। তার জন্য তিনি গোটা সমাজ ও তার বৈশিষ্ট্যকে গল্পের কয়েকটি পাতায় তুলে এনেছেন।

□ গফুর দরিদ্র চাষি, সে কৃষক সম্প্রদায়ের একজন শোষিত নিপীড়িত ও সর্বহারা প্রতিনিধি। গ্রাম-বাংলার অধিকাংশ চাষি ছিল এই গফুরের মতো। তারা হৃদয়হীন জমিদারের নিদারুণ শোষণের শিকার। তারা ভাগে চাষ করে, কিন্তু সবই প্রায় দিয়ে দিতে হয় জমিদারকে। আর ফসলের ভাগ দিতে না পারলে জমিদারের পেয়াদা এসে ধরে নিয়ে যেত চাষিকে, সেখানে জুটত চাবুক, কোনো রকমে আধমরা হয়ে ফিরে আসতে হত কুটিরে, কুটিরের অবস্থাও জরাজীর্ণ, চালে খড় নেই, দেওয়াল ধসে পড়েছে বৃষ্টির জলে। অনাহারে দুর্বল চাষি অসুস্থ হয়ে পড়ে, কিন্তু জমিদার ডাকলে তাকে যেতেই

Scanned by CamScanner

হবে, কারণ জমিদার কেনো আপত্তি শুনবে না। কোনো চাষি জমিদারের বেগার খাটতে না গেলে তার পরিণাম বড় ভয়াবহ। সমাজে জমিদারের শোষণ ও নিপীড়ন সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বাস্তব ধারণা ছিল। জমিদারি প্রথার তাণ্ডব যে কী ভয়াবহ ছিল সে সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। জমিদারের হৃদয়হীনতার চিত্র তিনি নিখুঁতভাবে অঙ্কন করেছেন। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দরদী মন না থাকলে এটা সম্ভব হত না।

❑ গফুরের অবস্থার মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র এই নিষ্ঠুর সত্যের রূপায়ণই দেখিয়েছেন। একজন সামান্য দরিদ্র চাষিকে নিয়ে শরৎচন্দ্র গল্প লিখেছেন। বাংলার শোষিত চাষিদের প্রতি শরৎচন্দ্রের সমবেদনা ও ভালোবাসা যে কতটা নিবিড় ছিল এটা তারই প্রমাণ। জমিদারের খুঁটিনাটি আচরণ, এমনকি সংলাপ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সমাজ সম্পর্কে তাঁর চেতনা স্বচ্ছ ও গভীর ছিল। তিনি দেখেছেন শুধু জমিদার নয়, সমাজে তর্করত্নের মতো মানুষের দলও দরিদ্র মানুষের ওপর কী নির্মম অত্যাচার চালায়। এইসব ব্রাহ্মণ পূজারি তর্করত্নের দল জমিদারদের মন জুগিয়ে চলে এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে। এরা পূজা করে, শাস্ত্র পাঠ করে এবং শুদ্ধ পাটের বস্ত্র পরিধান করে। কিন্তু এদের মন মোটেই শুদ্ধ নয়। এইসব বকধার্মিক তর্করত্নের দলই গফুরের মতো অসহায় দরিদ্র চাষিদের ওপর অত্যাচার করে। সমাজসচেতন লেখক শরৎচন্দ্রের প্রখর দৃষ্টিতে এই সত্য ধরা পড়েছে। এরা অবস্থাপন্ন, কিন্তু একগণ্ডা খড় দিয়ে কারও উপকার করে না। শুধু নীতিকথা, ধর্মতত্ত্ব, ইহকাল, পরকাল, পাপপুণ্যের কথা শোনায়। এদের কাছে গোমাতা ভগবতী এবং গো হত্যা বড় পাপ। কিন্তু এদেরই একজন প্রতিনিধি তর্করত্ন গফুরের কাতর অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও এক কাহন খড়ও ধার দেয় না। অথচ তার বাড়িতে চার-চারটে খড়ের গাদা। এই তর্করত্ন বলে গফুর নাকি গো-হত্যার দায়ে পড়বে এবং তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। হ্যাঁ, প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। কারণ সে প্রায়শ্চিত্তের পূজা, ক্রিয়াকলাপ তর্করত্নই হয়তো করবে এবং দক্ষিণা স্বরূপ ভিটেমাটি আত্মসাৎ করবে।

❑ সমাজের আরেকটা কলঙ্ক হল জাতপাতের বিচার, মুসলমানের স্পর্শে হিন্দুর পুকুরের জল অপবিত্র হয়। তাই আমিনাকে কাঠফাটা রোদ্দুরে বহুদূরে গিয়ে পুকুর থেকে জল আনতে হয়। গল্পের শেষদিকে গফুর যখন ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও মানসিক উত্তেজনায় তার প্রাণপ্রিয় পুত্রসম মহেশকে মেরে ফেলে, তখন তার পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ থাকে না। যে ফুলবেড়ের চটকলে মেয়েদের ইজ্জত থাকে না সেখানে গফুর চলে যেতে বাধ্য হয় মেয়ে আমিনার হাত ধরে আর রেখে যায় যৎসামান্য সম্বল মহেশের প্রায়শ্চিত্তের জন্য।

❑ 'মহেশ' গল্পে শরৎচন্দ্র গফুরের নিরীহ ষাঁড়ের প্রতি অপত্যস্নেহ, দারিদ্রের জ্বালা, জমিদারের নিপীড়ন, সামাজিক নিষ্পেষণ সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। গ্রামের শোষিত-নিপীড়িত-অসহায় মানুষের প্রতি শরৎচন্দ্রের ভালোবাসা ছিল সুগভীর। তিনি নিজের চোখে সমাজকে ভালো করে দেখেছিলেন। তাই তাঁর ছোটগল্পে সমাজের মানুষগুলি এত জীবন্ত এবং ঘটনাগুলি এত মর্মস্পর্শী ও বাস্তবধর্মী হয়ে উঠতে পেরেছে।

Scanned by CamScanner